ভোরের কাগজ

তারিখ 30 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন নিয়ম : বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ এবং বিসিএস পরীক্ষায়

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

মূল বেতনের ৯০% এখন সরকার দিচ্ছে, তাই এটিকেও এক ধরনের সরকারি বা আধাসরকারি চাকরি মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে এমনিতেই সর্বক্ষেত্রে মেধাবীরা সংখ্যায় অমেধাবীদের চেয়ে কম। সুতরাং যেখানেই প্রতিযোগিতার কোনো বাছাই-যাচাইয়ের উন্মুক্ত ব্যবস্থা তৈরি হয় সেখানেই অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ও যোগ্যদের সমাবেশটি বেশিই ঘটে। তারা তদবির, দলবাজি, অর্থ প্রদান ইত্যাদিতে এগিয়ে থাকে। স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর জিবির সদস্যদের বড়ো অংশই হচ্ছে এলাকার প্রভাবশালী, সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক তথা ক্ষমতাসীন দলীয় পরিচয়নির্ভর। সুতরাং এক্ষেত্রে দল ও বলয়ের বাইরে, কিংবা টাকা-পয়সা লেনদেন, ডোনেশন দেওয়ার অঘোষিত বিধানের বাইরে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি খুব কমই কার্যকর ছিল। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি, মাদ্রাসা পর্যায় পর্যন্ত শতকরা ৯৬% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। ছাত্রছাত্রীদের ৯৪-৯৫% অংশও এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে। আমি বলছি না, সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকই অনিয়ম আর দুর্নীতি-চর্চার মাধ্যমে

চাকরি পেয়েছেন, সবাই খুবই নিম্নমানের। এভাবে সাধারণীকরণ করা ঠিক নয়, সেভাবে দেখাও হচ্ছে না। আমার জানা মতে, বেশকিছু বেসরকারি স্কুল ও কলেজে একমাত্র মেধাবীরাই নিয়োগ পেয়েছেন এবং সেসব স্কুল ও কলেজ মানসম্মত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সুনাম ঢেকে রাখার কোনো উপায় নেই। কিন্তু অধিকাংশ মাদ্রাসা, গ্রামীণ স্কুল ও কলেজের অবস্থা এক্ষেত্রে এতোই শোচনীয় যে, ওগুলোতে লেখাপড়ার সঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষকদেরই সম্পর্ক প্রায় নেই। প্রায় ১ হাজার ৫০০ মাদ্রাসা ও স্কুল এবং কলেজ থেকে গত বছর কোনো ছাত্রছাত্রী পাবলিক পরীক্ষায় পাসই করতে পারেনি বলে জানা গেছে। ৫ থেকে ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। পাসের যে হারটি আমরা পেয়ে থাকি তা খুব একটা নির্ভরযোগ্য কিনা সে সম্পর্কেও আমাদের সন্দেহ আছে, আছে বলেই তো পিএসসির মতো একটি ব্যবস্থা ক্যাডার সার্ভিসে লোক নিযুক্তির জন্য দেশে রাখতে হচ্ছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে, আমাদের গ্রোডাক্টদের বাংলা বা ইংরেজি ভাষাজ্ঞান খুব একটা সন্তোষজনক নয়।

যে কথা বলছিলাম, বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে এখন জিবির কর্তৃত্ব ভেঙে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসককে সভাপতি, জেলা শিক্ষা অফিসারকে সদস্য সচিব করে আট সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। কমিটির সদস্য হিসেবে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালক, জেলা সদরের একটি বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, জেলা সদরের বৃহত্তর সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও জেলা সদরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে সদস্য রাখা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী কমিটিতে জেলা সদরের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও মাদ্রাসা অধ্যক্ষকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হবে বলে জানানো হয়েছে। নতুন এই বিধিতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাবেন। জেলা প্রশাসক প্যানেল থেকে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের আওতায় ন্যস্ত করবেন। নিম্ন মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

> **বর্তমানে যে গতিতে পিএসসির কাজ চলছে তাতে একটি ব্যাচ বের হতেই তিন-চার বছর সময় লেগে যাচ্ছে। এটি মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। প্রতি বছর এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কিভাবে ব্যাচ বের করা যায় সে ধরনের আয়োজন থাকতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি, যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত মেধাবীদের আইডেন্টিফাই করাই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।**

আপাতদৃষ্টিতে নতুন নিয়োগ নিয়মটি ভালো এবং গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হবে। বিশেষত বাতিলকৃত নিয়োগ বিধির চাইতে এক-দুইধাপ এগিয়ে আসার লক্ষণ এতে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটিও আমলাতন্ত্রের চিন্তার ফসল বলে ওর চৌহদ্দি থেকে বের হতে পারেনি। ফলে এর থেকে শেষ বিবেচনায় শিক্ষা ব্যবস্থার লাভ কতোখানি হবে, বিশেষত যেখানে দেশের ৩০ হাজারের মতো বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার অবস্থা যেখানে শোচনীয় সেখানে জেলাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের প্যানেল তৈরির ব্যবস্থাটি কতোখানি সুফল বয়ে আনবে বলা মুশকিল। শিক্ষক প্যানেল তৈরিতে যাদের সদস্য রাখা হয়েছে, তাদের বড়ো অংশই আমলা। আমলাদের বাস্তবতা এবং যোগ্যতা দিয়ে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগের ধ্যান-ধারণা নিয়েই প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। আমরা কবে এ ধরনের আমলা নিয়ন্ত্রিত যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসবো বা আসতে পারবো— সেটিই বিবেচ্য বিষয়। মনে হচ্ছে, আমরা আরো বেশি আমলাদের হাতেই বন্দী হয়ে যাচ্ছি। দেশে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গড়ে তোলা কি খুব কঠিন এবং দুরূহ কাজ? বর্তমান পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরই এটি একটি শাখা হতে পারে। সেভাবে এর কর্ম পরিসর ঢেলে সাজানো যেতে পারে। দেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরই কার্যক্রমকে বছরভিত্তিক ক্যাডার, শিক্ষক (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও মাদ্রাসা) নিয়োগের কার্যক্রমের বাধ্যবাধকতায় আনার উপায় বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বর্তমানে যে গতিতে পিএসসির কাজ চলছে তাতে একটি ব্যাচ বের হতেই তিন-চার বছর সময় লেগে যাচ্ছে। এটি মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। প্রতি বছর এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কিভাবে ব্যাচ বের করা যায় সে ধরনের আয়োজন থাকতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি, যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত মেধাবীদের আইডেন্টিফাই করাই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেভাবে কাজ না করা গেলে ৩০-৪০ বছরের পুরোনো ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া ও যাচাই-বাছাই করা হলে বাছাই জট তো লাগবেই। যা ইতিমধ্যে পিএসসিতে লেগে গেছে। এতেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রবেশ করেছে। তাই পুরো বিষয়টি নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কিন্তু একাডেমিক মানদণ্ডকে সমুজ্জ্বল করে এমন ভাবনা-চিন্তাই প্রাধান্য দেওয়ার চিন্তা করতে হবে। তবেই পিএসসির প্রতি মানুষের আস্থা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা যেতে পারে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিসিএস ক্যাডার পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ন্যূনতম শতকরা ৪৫ নম্বর প্রাপ্তির শর্তটি যোগ করায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ তা মেনে নিতে পারছে না। ধারণা করা হচ্ছে যে, সব ছাত্রছাত্রী এর বিরোধিতা করছে তাদের এ ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। বিষয়টির পক্ষে এবং বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে এবং কোনো যুক্তিই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কমিশন হয়তো মনে করছে, যে দেশের ক্যাডার সার্ভিসে যারা যাবেন তাদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের যেহেতু গুরুত্ব রয়েছে তাই ৪৫%-এর নিচে যারা বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে নম্বর পেয়েছে তাদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া বিসিএস পরীক্ষায় এখন যেহেতু প্রয়োজনের চেয়েও এতো বেশিসংখ্যক অংশগ্রহণ করে থাকে যার ফলে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটিই বিলম্বিত হচ্ছে। তাই প্রাথমিক স্ক্রুটিনি হিসেবেই নতুন শর্তটি আরোপিত হয়েছে। কমিশনের এ ধরনের ভাবনার যেমনি ভিত্তি এবং যুক্তি আছে, তেমনি এমন শর্তারোপ করলেই বাংলা, ইংরেজিতে দক্ষতা আছে এমন ক্যাডার পিএসসি পেয়ে যাবে— তা নাও হতে পারে। কেননা দেশে আসলেই শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের কোনো নিয়মনীতি অব্যাহত আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তর মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা বা ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের সংকলন পড়ে এবং আনাড়ি শিক্ষকদের হাতে পড়ে খুব কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। আমাদের এসএসসি ও এইচএসসি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের দেখে একজন শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান বা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করা সহজ কাজ নয়। বিশেষত নকল ও মুখস্ত বিদ্যা যেখানে খাতায় লেখা এবং নম্বর প্রাপ্তির প্রধান উপায় সেখানে ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত দক্ষতা বা মেধা যাচাই কিভাবে সম্ভব? সুতরাং পিএসসির নতুন নিয়মে খুশি হওয়া বা হাততালি দেওয়ার অবকাশ খুব দেখি না। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫ লাখের অধিক ছাত্রছাত্রী এসএসসি বা এইচএসসি পাস করে বের হলেও খুব সামান্যসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেই পাওয়া যাবে যাদের ভাষাজ্ঞান কাঙ্ক্ষিত মানের হচ্ছে। সুতরাং গাড়িটা জুড়তেই যদি হয়, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই জুড়তে হবে— সেখান থেকেই গড়ে তুলতে হবে ছাত্রছাত্রীদের।

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী : অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।